দিনের পর দিন...

- শফিক রেহমান

ফুরিয়ে গেল এপৃল ২০০৪।

চলে গেল ৩০ এপৃল।

বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলো না।

বাংলাদেশে কোনো গণঅভ্যুত্থান হয়নি।

বাংলাদেশে কোনো সেনা অভ্যুত্থান হয়নি।

বাংলাদেশে কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপ হয়নি।

বাংলাদেশে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়নি।

বাংলাদেশে কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়নি।

বাংলাদেশে জোট সরকারের পতন হয়নি।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

১ এপৃল বাংলাদেশ যেমন ছিল ঠিক তেমনটাই আছে ১ মে-তে।

মধ্য বৈশাখের সূর্য জ্বলছে মেঘ বিহীন নীল আকাশে।

কিছু চিল ঘুরপাক দিয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক উপরে।

কার্নিশ আর গাছের ডালে কিছু কাক ডাকছে।

একটু হাওয়ায় গাছের সবুজ পাতাগুলো দুলছে।

সবই ঠিক আগের মতোই আছে।

গতকাল ছিল শুক্রবার। আর আজ মে দিবসের সরকারি ছুটি উপলক্ষে রাজধানীতে ট্রাফিক কম।

যানবাহন চলাচল কম হবার আরেকটি কারণ বাংলাদেশ ছুটির ফাদে পা দিয়েছে।

৩০ এপৃল ছিল শুক্রবার। ১ মে শনিবারে মে দিবস। ৩ মে সোমবারে ঈদে মিলাদুন্নবী এবং ৪ মে মঙ্গলবারে বৌদ্ধ পূর্ণিমা। মাঝখানের ২ মে রবিবার কোনো ছুটির দিন না হলেও অনেকেই সেটা উপেক্ষা করতে যাচ্ছে। ৩০ এপৃল থেকে ৪ মে এই পাচ দিনে ছুটি উদযাপিত হবে গণনা করে আওয়ামী লীগ ২৮ এপৃল বুধবার এবং ২৯ এপৃল বৃহস্পতিবারে হরতাল ডেকেছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশ সাতদিন অচল অবস্থার দিকে পা দিয়েছিল।

কিন্তু আওয়ামী লীগের দুরভিসন্ধি সফল হয়নি। আওয়ামী সমর্থক দৈনিক পত্রিকাগুলোর মতে, ২৮ এপৃল বুধবারের হরতাল ছিল ঢিলেঢালা।

ওই দিনেই আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল জলিল গণঅভ্যুত্থান আয়োজনে প্রকারান্তরে তার দলের শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার পর ২৯ এপৃল বৃহস্পতিবারের হরতাল ফ্লপ করে যায়।

রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে হরতাল ভোতা হয়ে যায় বৃহস্পতিবার ২৯ এপৃলে।

এই দিন ট্রাক-বাস-কোচসহ অনেক প্রাইভেট কার চলাচল করে সকাল থেকে। অনেক দোকানপাটও খোলা থাকে। অনেক বেসরকারি অফিসও চালু থাকে।

হরতালের ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠার জন্য শুক্রবার ৩০ এপৃলে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিও তাদের কার্যক্রম চালু রাখে।

অর্থাৎ এপৃলের শেষ দিনটি শুক্রবার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সচল থাকে।

এই শুক্রবার ৩০ এপৃলে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দল-ও পূর্ণভাবে সক্রিয় থাকে।

ওই দিন আওয়ামী লীগ সক্রিয় থেকেছে এপৃল ব্যর্থতার ধ্বংসস্তূপ থেকে যা কিছু সম্ভব ও যতোটুকু সম্ভব তার উদ্ধার কাজে।

ওই দিন বিএনপি সক্রিয় থেকেছে আওয়ামী এমপিরা যেন এপৃল ব্যর্থতাকে কবর দিয়ে সংসদে ফিরে এসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখেন সেই আবেদন জানানোর জন্য।

১ মে-তে ছুটির দিনে মইন একটা লং ড্রিংক বানিয়ে আস্তে আস্তে সিপ করছিল।

পিমস নাম্বার ওয়ানের (Pimm's no 1) সঙ্গে ঠাণ্ডা সোডা ওয়াটার এবং স্লাইসড তরমুজ, আপেল, লেবু ও শশা মিশিয়ে মইন ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল তার গ্লাসে।

সোডা ওয়াটারের বুদবুদগুলো উঠে যাচ্ছিল গ্লাসের উপরের দিকে।

বুদবুদগুলো মিশে যাচ্ছিল গ্লাসের ওপরের ভাগে জমা হওয়া ফেনার মধ্যে।

বুদবুদগুলো অস্তিত্ব বিহীন হয়ে যাচ্ছিল।

বুদবুদগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল।

এভাবেই কি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল জলিল এপৃলের বুদবুদ তুলে হারিয়ে যাবেন?

তিনি কি দলের মধ্যে অস্তিত্ব বিহীন না হলেও গুরুত্বহীন ব্যক্তিতে পরিণত হবেন?

কি ছিল তার অপরাধ?

কি বলেছিলেন তিনি?

১৪ মার্চ ২০০৪-এ ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটির মিটিংয়ে তিনি বলেন, ৩০ এপৃলেই হবে জোট সরকারের শেষ দিন। সাত দিন পরে ২১ মার্চে কবিতা ও গান ডটকম আয়োজিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে অনলাইন ইন্টারভিউতে তিনি বলেন, *৩০ এপৃলের মধ্যে সরকার পতন আল্লাহ ছাড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।*

দুই দিন পরে ২৩ মার্চে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক মুলতুবির পরে এক প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেন, *তায়াক্কুল তু আল্লাহ। আল্লাহ সহায় থাকলে ৩০ এপৃলের মধ্যেই সরকারের পতন ঘটানো হবে।*

পরদিন ২৪ মার্চে তিনি বলেন, *৩০ এপৃলের মধ্যে সরকারের পতন নিশ্চিত করতে সংসদ থেকে পদত্যাগসহ যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু করা হবে।...১ মে-তে খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী রূপে আবির্ভূত হবেন।*

মধ্য মার্চে আবদুল জলিল জোট সরকারের পতনের জন্য দেড় মাস টাইম ফ্রেম দিয়েছিলেন। এপৃলের শুরুতে তিনি এই টাইম ফ্রেম না বাড়িয়ে বরং আরো ছোট করা শুরু করেন। জলিল এপৃলের ৩০ দিন থেকে ১১ দিনে এবং সবশেষে এক ঘণ্টাতে তার টাইম ফ্রেম সীমিত করেন।

১৮ এপৃলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেন, *৩০ এপৃলের আগে ১১ দিনই যথেষ্ট...অতীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায়, মাত্র চার দিনে সরকারের পতন হয়েছে।*

২১ এপৃলে হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচি ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে একটি প্রেস কনফারেন্সে জলিল বলেন, *আমি এখন পর্যন্ত আশাবাদী...মাত্র এক ঘণ্টার আন্দোলনেই সরকারের পতন হতে পারে...এক ঘণ্টা সময়ই তাদের পতনের জন্য যথেষ্ট...।*

এই পর্যায়ে আবদুল জলিল সপ্তাহ এবং তারিখের হিসাব গুলিয়ে ফেলেন।

২৬ এপৃলে সন্ধ্যায় দৈনিক *আজকের কাগজ* ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে তাকে প্রশ্ন করা হয় :

আপনি বলেছিলেন, এপৃলের তৃতীয় সপ্তাহে আপনি ট্রাম্প কার্ড ছাড়বেন, এখন তো এপৃলের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। তাহলে কবে ছাড়বেন সেই ট্রাম্প কার্ড।

উত্তরে জলিল বলেন, *তৃতীয় সপ্তাহ এখনো যায়নি, তাছাড়া কৌশলগত কারণে চতুর্থ সপ্তাহেও এটা ছাড়তে পারি। আমার এই ট্রাম্প কার্ড অবশ্যই কার্যকর হবে...। ৩০ এপৃল এ সরকারের পতন হবে না, আমি তা বিশ্বাস করি না। ৩০ এপৃলেই এ সরকারের পতন হবে। ৩০ এপৃল জনগণ বিজয় উল্লাস করবে...।*

২৭ এপৃলে দৈনিক আজকের কাগজের ফ্রন্ট পেজে ফার্স্ট লিড আইটেম হিসেবে পরিবেশিত এই খবরে দেখা যায়, এপৃলের চতুর্থ সপ্তাহের শেষাংশে থাকা সত্ত্বেও আজকের কাগজ-এর সাংবাদিকরা এবং জলিল এপৃলের তৃতীয় সপ্তাহেই অবস্থান করছেন।

পুওর জলিল।

বেচারা জলিল।

পার্টি সহযোগী, সহকর্মী ও সমর্থক দ্বারা পরিত্যক্ত জলিল শুধু বলতে পারেন, তিনি যা কিছু বলছেন আর যা কিছু করছেন তার পেছনে তার সভানেত্রীর সমর্থন আছে।

জলিল ঠিকই বলেছিলেন।

কারণ ৩০ এপ্রিলের প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনা স্বীকার করেন, জলিলের বক্তব্যগুলো তার *নলেজ*-এ ছিল।

২৬ এপৃল মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ ছুটি কাটাতে আগ্রহী ঢাকাবাসীদের একাংশ রাজধানী ছেড়ে মফস্বল অভিমুখী হয়।

পরদিন ২৭ এপৃল বুধবার হরতাল হয় ঢিলেঢালা। এদিনেই আবদুল জলিল বুঝতে পারেন ৩০ এপৃলের মধ্যে সরকারের পতন হবে না। তিনি চরম সত্যের মুখোমুখি হন এবং পরাজয় মেনে নেয়ার বিষয়টি জনসমক্ষে স্বীকার করা সম্পর্কে সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেন।

২৮ এপৃল বৃহস্পতিবারে রাজধানীতে হরতাল ফ্লপ করে। আবদুল জলিল তার গুলশানের বাসায় কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ডাকেন। সম্পূর্ণ এবাউট টার্ন করে তিনি বলেন,

জনগণের প্রত্যাশা জোট সরকারের পদত্যাগ ও মধ্যবর্তী নির্বাচন, ৩০ এপৃল নয়। আমি মার্চ-এপৃলের মধ্যে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার কথা বলেছি...। আমার নেত্রীর নির্দেশে এ কথা বলেছি। আমি দলের সাধারণ সম্পাদক। এই পদে অন্য কেউ থাকলেও তিনিও একই কথা বলতেন। কারণ এটা দলের বক্তব্য। দলের অন্য নেতারা এই বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। এটা ঠিক নয়। দলের মধ্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলীয় ফোরামে এটা সকলেই সমর্থন করেছেন। বাইরে কে কি বললো সেটা বড় কথা নয়...।লক্ষ্য অর্জনে ব্লাইন্ড খেলেছি। ট্রাম্প কার্ডকে আমি শেষ অস্ত্র হিসেবে বুঝিয়েছি। সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, আমাদের সফলতা এখানেই। জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে...আমার পরাজয় হয়নি...গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণায় জনগণ উদ্বেলিত হয়েছে। সরকার ঝাকুনি খেয়েছে...এখনও আমি আশাবাদী...পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে এগোলে এ মাসের (এপৃল) মধ্যেই সরকারের পতন সম্ভব।...তবে নির্ধারিত সময়ে সরকার পদত্যাগ না করলে কিছুটা সময় নিতে পারে। সমন্বিতভাবে কাজ না করলে পিছিয়ে যেতে পারে...ট্রাম্প কার্ড আমার কাছে আছে। তা আমি শেষ মুহূর্তে ছাড়বো। এটা অত্যন্ত সিক্রেট। এই কৌশল এখন বলবো না। যখন ছাড়বো তখন দেখবেন...।সংসদ থেকে পদত্যাগের সময় বা দিনক্ষণ এখনো আসেনি। দলীয় এমপিদের পদত্যাগপত্র দেড় বছর আগেই সভানেত্রীর কাছে জমা দেয়া আছে।...ঈর্ষান্বিত হয়ে (দলের) কেউ কেউ উপহাস করতে পারে। আগামীকাল ২৯ এপৃলে আমি নাকি ব্যাংককের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ছি। আসলে আমি তিন মাস পর পরই মেডিকাল চেকআপ করাই। সেটা সিংগাপুর বা ব্যাংকক নয়, কলকাতায় যাই...। সরকারের কাছ থেকে আমি টাকা খাইনি...। যারা এই কথা বলছেন বা যদি কেউ বলে থাকেন তাহলে তারাই সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়েছেন ও সাবোটাজ করছেন...।

এই দিন এনটিভি কে দেয়া একটা ইন্টাভিউতে জলিল বলেন,

৩০ এপৃলের কথা আমার বলা নয়। এ ডেডলাইন সাংবাদিক বন্ধুদের দেয়া। আমি বলেছিলাম মার্চ-এপৃলের মধ্যে সরকার পতনের কথা। কোনো সুনির্দিষ্ট সময় আমি বলিনি। বলেছি মার্চ-এপৃলের মধ্যে পতন হতে পারে। ৩০ এপৃলের মধ্যে যে কোনোদিনের কথা বলেছি। আমি আশাবাদী - এখনো ৪৮ ঘণ্টা আছে। পরিকল্পনা মোতাবেক সব কিছু চললে নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের পতন ঘটবে।

সাংবাদিকদের কাছে আবদুল জলিল আরো বলেন, *৩০ এপৃলের বিজয় উল্লাস সম্পর্কে আমি জোক করে বলেছি। ওটা বলার সময়ে আমার মুখে হাসি ছিল...।*

২৮ এপৃলে আদুল জলিল পিছু হটলেন। কিন্তু তার স্বীকারোক্তি ছিল স্ববিরোধী, প্রলাপ পূর্ণ এবং মিথ্যা।

স্ববিরোধী কারণ, তিনি ৩০ এপৃল ডেডলাইন থেকে সরে গেলেও ৩০ এপৃলের মধ্যেই সরকার পতন বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন।

জনগণ উদ্বেলিত হওয়া, সরকারের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া, শেষ মুহূর্তে ট্রাম্প কার্ড ছাড়া হবে...এসব উক্তি ছিল নিছক প্রলাপ।

৩০ এপৃলের ডেডলাইনটি সাংবাদিকরা দিয়েছেন এই উক্তিটি ছিল ডাহা মিথ্যা। পুরো দেড় মাস জুড়ে সারা বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে এই ডেডলাইনের ভিত্তিতে যেটা তিনিই দিয়েছিলেন সভানেত্রীর নির্দেশে।

আবদুল জলিল যখন নিজেকে বাচানোর চেষ্টা করছিলেন তখন তার সভানেত্রী কি করছিলেন?

২৫ এপ্রিল রবিবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন,
বাংলার জনগণ এই সরকারের বিদায় চায়। তাই তাদের প্রতি অনাস্থা এনেছে। এখনই নির্বাচন দিন – নইলে পালানোর পথ পাবেন না।

লক্ষণীয় যে, এই ভাষণে শেখ হাসিনা ৩০ এপ্রিলে সরকার পতন বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি ২৮ ও ২৯ এপ্রিলে আওয়ামী লীগ আহূত হরতালের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে চান।

২৮ এপ্রিলে ঢিলেঢালা হরতালের সময়ে শেখ হাসিনাও চরম সত্যের মুখোমুখি হন। তিনি তার সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির করেন ৩০ এপ্রিলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করবেন। শেখ হাসিনা দুটি সিদ্ধান্ত নেন : *এক.* আবদুল জলিলকে রক্ষার জন্য কতোদূর এগোবেন। এবং *দুই.* ব্যর্থ আন্দোলনকে সফল রূপে চিত্রিত করার জন্য তার বক্তব্যটি কি হবে?

৩০ এপ্রিলে বহুদিন পরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদককে পাশাপাশি দেখা গেল তাদের দুজনার পরিকল্পিত প্রেস কনফারেন্সে। এই কনফারেন্সে উভয়ে উভয়কে রক্ষা করে চলেন। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবও ছিল না কারণ ৩০ এপ্রিল ডেডলাইনের স্রষ্টা যে এরা দুজনই সেটা এখন সর্বজন বিদিত।

৩০ এপ্রিলের এই ঐতিহাসিক প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনা বলেন,
৩০ এপ্রিল ইজ দি বিগিনিং অফ দি এন্ড (৩০ এপ্রিল হচ্ছে সরকারের শেষ সময় বা পতনের শুরু)। ৩০ এপ্রিল এই সরকারের পতন যাত্রা শুরু। সরকারের প্রতি জনগণের অনাস্থা এবং সব ক্ষেত্রে সরকারের অসাংবিধানিক ও হিংস্র দমননীতি প্রমাণ করছে সরকারের পতন যাত্রা শুরু হয়েছে...। ৩০ এপ্রিল ব্যর্থ হয়ে যায়নি...। এর মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাথমিক বিজয় ঘটেছে...। কালবৈশাখি তো সবে শুরু...। ট্রাম্প কার্ড কি তা বলে দেবো কেন? সময় আসলে ছাড়বো। সেটা তো দলের সাধারণ সম্পাদকের হাতে আছে। আমি অবশ্য বৃজ খেলা ভালো জানি না। তবে সময় হলেই ট্রাম্প কার্ড ছাড়া হবে।...সবেমাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক কল দিয়েছেন। এতেই (সরকারের) এই অবস্থা। এরপর আমার ১৪জন প্রেসিডিয়াম সদস্য তো বাকি রয়েছেন। আমি ডাকলে তো (সরকার) আর থাকবেই না...। আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে বলে আমি মনে করি না। রাজনীতিতে এটা একটা সাধারণ বিজয়। সরকারকে একটা ওয়ার্নিং দিয়েছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক। দুই পা এগিয়ে এক পা পেছানো একটা রাজনৈতিক কৌশল। আমি বিশ্বাস করি, জনগণ এই সরকারের পতনের জন্য রাজপথে নামবে। আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সরকারের পতন হবেই।...(৬ মে-তে আমার বিদেশ যাত্রায়) আন্দোলন ব্যাহত হবে কেন? এক সপ্তাহ থাকবো। এতে আর এমন কি সমস্যা হয়ে যাবে? ৮ মে (আমেরিকায়) মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন, ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন... আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই সময় কাটাতে যাচ্ছি। অন্য কোনো কারণে নয়।

৩০ এপ্রিলের এই প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনা আরো বলেন,
৩০ এপ্রিলের ঘোষণাকে ব্যর্থ বলা যায় না। হয়তো জনগণের অনেক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দলের সাধারণ সম্পাদক কোনো ঘোষণা দিলে তা সমর্থন করতে হয়। এই ঘোষণা আমার নলেজে ছিল।... ট্রাম্প কার্ড এখনো জলিল সাহেবের কাছেই আছে। তাছাড়া ৫২টি কার্ডের মধ্যে আরো ৫১টি বাকি আছে।... জাতির কাছে কোনো অপরাধ আমরা করিনি যে, ক্ষমা চাইতে হবে। বরং সরকারকেই ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ তারা দেশের মানুষের ওপর, মহিলাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে।

মইনের চিন্তা ভাঙলো ফোনের শব্দে।

৩০ এপ্রিলে শুধু একটি জায়গায় আমি উল্লাস দেখলাম। ইনডিয়ান হাই কমিশন কর্তৃক পূর্ব আয়োজিত ওসমানী মিলনায়তনে সেদিন এসেছিলেন ইনডিয়ান পপ গায়িকা পেনাজ মাসানি ও তার ট্রুপ। তারা নতুন-পুরনো হিন্দি ফিল্মি গান গেয়েছেন এবং নেচেছেন। ওসমানী মিলনায়তনে আমন্ত্রিত দর্শক আনন্দিত ও উল্লসিত হয়েছেন। কিন্তু এই আনন্দ-উল্লাসে অংশ নিতে গিয়েছিলেন শুধু একজন সেমি উচু আওয়ামী নেতা, মেহেরপুরের সাবেক এমপি প্রফেসর আবদুল মান্নান। শেষ পর্যন্ত ৩০ এপ্রিল এভাবে চলে গেল? এতো বড় অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স এর আগে আর কখনো এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে কি? সারা দেশকে হুলিয়ে দিয়ে এখন হাসিনা বলছেন, ৩০

এপৃল ছিল দুই পা এগিয়ে এক পা পেছানোর কৌশল! আর জলিল বলছেন ডেডলাইন ছিল একটা জোক! মিলা বললো।
আবারও সেই পুরনো গল্পটা তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি। মইন বলা শুরু করলো।
বৃটিশ আমল।
এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাম অঞ্চলে সরেজমিনে তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।
তার পেছনে আর্দালি।
গোরা ম্যাজিস্ট্রেটের মাথায় শোলার হ্যাট। পরনে খাকি বুশ শার্ট ও হাফ প্যান্ট বা শর্টস। পায়ে খাকি মোজা ও কালো বুট।
বৈশাখের দুপুরে প্রচণ্ড গরমে হাটতে হাটতে সাহেব ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।
হঠাৎ একটি পুকুরের ঠাণ্ডা পানি দেখে সাহেব থমকে দাড়ালেন।
তিনি জুতা-মোজা, কাপড়-জামা সব খুলে ঝাপিয়ে পড়লেন সেই পুকুরে।
আহ! কি শান্তি।
সাহেব সাতার কেটে চললেন ঠাণ্ডা পানিতে।
হঠাৎ সাহেব চিৎকার করে উঠলেন।
তিনি প্রাণপণে সাতরে পুকুরের পাড়ে উঠলেন এবং আর্ত চিৎকার করে আর্দালিকে নিজের পশ্চাদ্দেশ দেখালেন।
সাহেব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।
ভীত এবং উলঙ্গ মনিবের পশ্চাদ্দেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে আর্দালি বললো, এটা একটা জোক।
হোয়াট ডু ইউ মিন? তুমি কি বলছো? সিক্স ইঞ্চেস ডিপ ইনসাইড - স্টিল এ জোক? (Six inches deep inside, still a joke?) ছয় ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, তবুও বলছো এটা একটা জোক? কাতর স্বরে সাহেব বললেন।
আমার ধারণা, শেখ হাসিনা এবং আবদুল জলিল বাদে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, সমর্থকরা এখন দলীয় সেক্রেটারি জেনারেলের জোকের কামড়ে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছেন। কিন্তু তারা কেউ-ই এ যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারছেন না।
রাখো তোমার জোক। মিলা ধমক দিল। সারা দেশ দেড় মাস ধরে তোলপাড় হয়ে গেল জলিলের এই ঘোষণায়। হরতাল হলো কয়েকদিন জুড়ে। বাস পুড়লো খান ছয়েক। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকলো। হাজার পনেরো মানুষ হাজতে গেল। ঢাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢিলা হয়ে গেল। এসব কি কোনো ঠাট্টা-ইয়ার্কির কথা? মিলার স্বর তপ্ত।
কোনটা বড় জোক? আমার এই জোকটা, নাকি জলিলের জোকটা? মইন হাসতে থাকলো। ৩০ এপৃল ডেডলাইন ঘোষণার সময় এ জলিলই ইতিহাসে তার পাণ্ডিত্যের কথা জানিয়েছিলেন। এখন তিনি নিজেকে ইতিহাসের মূর্খতম ছাত্র রূপে জাতির কাছে প্রমাণ করেছেন। এমনকি তার অতীত সহযোগীরাও বলছেন, সময় তারিখ বেধে দিয়ে কখনো কোনো গণঅভ্যুত্থান হয়নি। আমি ঠাট্টা করতে চাই না। সত্যি বলতে কি, রাজনীতির এই করুণ পরিণতি দেখে আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। মইন হাসি থামিয়ে বললো।
এ রকম অবস্থা হলো কেন? বিএনপি-জামায়াতকে এতো বড় একটা অ্যাডভানটেজ কেন আওয়ামী লীগ দিল? এটা তো সম্পূর্ণ অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। আওয়ামী লীগের প্ল্যানটা কি ছিল বলো তো? কি ছিল তাদের সেই ট্রাম্প কার্ড? মিলা কৌতূহলী।
তোমার প্রশ্নের উত্তর শুধু শেখ হাসিনা ও আবদুল জলিলই জানেন। তবু আমি আমার ধারণাটি বলছি।
গত অক্টোবরে জোট সরকারের দুই বছর পূর্তির পরে শেখ হাসিনা ও আবদুল জলিল নভেম্বরে একটি একান্ত বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যদি জোট সরকারকে বাদবাকি তিন বছরই শাসন করতে দেয়া হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতকে হারানো দুষ্কর হবে। হাসিনা-জলিল লক্ষ্য করেন যে, দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরে আসছে। মানুষ নির্বাচনী ধকল সামলে নিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মন দিচ্ছে। বিএনপি-

জামায়াত জোট সরকার প্রাথমিক ইতস্ততার পর কনফিডেন্টলি শাসন কাজ চালাচ্ছে। এভাবে আরো তিন বছর চললে পরবর্তী নির্বাচনের আগে জোট সরকারের অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে।

সুতরাং আগামী বর্ষার আগে অর্থাৎ ৩০ এপৃলের মধ্যেই জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে?

কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব হবে?

উত্তর : সারা দেশকে অস্থির করে তুলতে হবে, ডিস্টেবিলাইজ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক. সারা দেশে ঘন ঘন হরতাল দিতে হবে। শেষের দিকে টানা হরতাল দিতে হবে। পাশাপাশি গণপ্রাচীর, মানববন্ধন, মিছিল, বিক্ষোভ, হাওয়া ভবন, সরকারি ভবন ঘেরাও ইত্যাদি চলতে থাকবে।

দুই. এসব বিক্ষোভ চলাকালে অবধারিতভাবে পুলিশের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হবে তাতে কোনো বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা নিহত হলে সেটাকে পুজি করে আরো এগিয়ে যেতে হবে।

তিন. ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে লেখক হুমায়ুন আজাদ গুরুতর আহত হওয়ার মতো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনীতিক যেমন ড. ইউনূস অথবা ড. কামাল হোসেনের মতো কেউ যদি এপৃলে নিহত বা আহত হয়ে যান তাহলে সেই ঘটনাকে আরো বড় পুজি হবে এবং তাকে কাজে লাগাতে হবে।

চার. ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম, বাম দলগুলো এবং ড. বি চৌধুরীর নবজাত বিকল্প ধারার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতে হবে। তারাও গণআন্দোলনে যোগ দেবেন এই আশা করা হয়।

পাচ. এপৃলের তৃতীয় সপ্তাহে *প্রশিকা*-র অন্তত দেড় লাখ কর্মচারী ও ঋণ গ্রহীতা তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের চাপে পড়ে রাজধানীতে এসে জড়ো হবে। সম্ভবত প্রেস ক্লাবের সামনে। এর ফলে সচিবালয়সহ সারা ঢাকা শহরের কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশিকা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে আওয়ামী কর্মী-সমর্থকরা। রাজধানীকে প্যারালাইজড করে দেয়ার এ প্ল্যানটিই বোধহয় ছিল ট্রাম্প কার্ড।

ছয়. রাজধানী অচল হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদকে বিকল করে দেয়া হবে। আওয়ামী লীগের এমপিরা একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করবেন। একই সঙ্গে বিএনপির ত্রিশ পয়ত্রিশজন এমপি এবং এরশাদের জাতীয় পার্টির কিছু এমপি পদত্যাগ করবেন। মোট ১০০-র বেশি এমপি পদত্যাগ করলে বাকি এমপিদের পক্ষে কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী আনা সম্ভব হবে না। এই স্ট্র্যাটেজি কার্যকর করার জন্য অর্থাৎ বিএনপি-জাতীয় পার্টির এমপিদের কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেবেন জনৈক শিল্পপতি-কাম-পত্রিকা মালিক যিনি এখন জেলে আছেন। স্মরণ করা যেতে পারে, আওয়ামী লীগ তাদের শাসন আমলে বিএনপির দুজন এমপি আলাউদ্দিন ও স্বপনকে ভাগিয়েছিল এবং তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, *সামনে আরো চমক আছে।* সম্ভবত তখনো আরো বিএনপি এমপিকে দল থেকে ভাগানোর জন্য শেখ হাসিনা রাজি করিয়েছিলেন। ২০০৪-এ এসে গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা সম্ভবত সেই একই টেকনিক প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

সাত. কিছু বিদেশি মিডিয়া যেমন বিবিসি বাংলা বিভাগ ও টাইম ম্যাগাজিন এশিয়া এডিশনের সমর্থন পাওয়া যাবে। ১৪ এপৃলে *বিবিসি* প্রকাশ করবে সেরা বাঙালির নাম এবং ওই একই সপ্তাহে *টাইম* প্রকাশ করবে *বাংলাদেশ একটি অকার্যকর দেশ* শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশ করবে। প্রথমটি আওয়ামী লীগকে দেবে সম্মান এবং দ্বিতীয়টি জোট সরকারকে দেবে অসম্মান। আওয়ামী লীগ এটি আচ করতে পেরেছিল। কারণ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যায় বিবিসি-র সেরা বাঙালির লিস্ট প্রচার এবং মার্চেই ঢাকায় এসেছিলেন টাইম-এর রিপোর্টার অরবিন্দ আদিগা।

আট. অধিকাংশ পৃন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ৩০ এপৃলের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে নেবে এবং গণঅভ্যুত্থান দমনে সরকার ব্যর্থ হলে জোরালোভাবে সেটা পাঠক-দর্শকদের সামনে পেশ করবে। দেশ অস্থিরতায় ডুবে যাবে।

নয়. সেই মুহূর্তে আসবেন কিছু বিদেশি ডিপ্লম্যাট দেশ রক্ষার আবেদন নিয়ে। গঠিত হবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যার দায়িত্ব হবে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন পরিচালনা।

দশ. এসব কূটনীতিদের নেতৃত্ব দেবেন সম্ভবত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হ্যারি টমাস। ১৭ এপৃলে ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, *ক্ষমতার প্রতি লোভ থাকলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় যেতে পারতাম।* শেখ হাসিনা জানেন, মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব। হয়তো ২০০৪-এর মার্চে সেই রকম একটি মুচলেকা শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন বলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের লক্ষ্যে এপৃলে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলেন।

আমার ধারণায় আওয়ামী লীগ এই দশটির ভিত্তিতে ৩০ এপৃলের ডেডলাইন ঘোষণা করেছিল। যেহেতু জলিল এখনো তার ট্রাম্প কার্ডটি দেখাননি সেহেতু উপরের এই দশটির মধ্যে একটি অথবা একাধিক এসাম্পশন বা ধারণা সঠিক হতে পারে। শেখ হাসিনা এটাও স্থির করে দেন যে, একমাত্র জলিলই হবেন ফ্রন্ট ম্যান। শুধু তিনিই বলবেন ৩০ এপৃলের কথা। মইন বললো।

এতো বড় প্ল্যান এতো শোচনীয়ভাবে ফেল মারলো কেন? মিলা প্রশ্ন করলো।

এর অনেক কারণ আছে। মইন বলতে থাকলো।

এক. সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আওয়ামী লীগের Psyche (সাইকি) বা মানসিক গঠন। শেখ হাসিনা ও আবদুল জলিল ৩০ এপৃলের প্রেস কনফারেন্সে প্রকারান্তরে বলেছেন, তাদের স্ট্র্যাটেজি ফেল করেনি। আওয়ামী লীগ পরাজয় মেনে নিতে পারে না। ১৯৯১-এর নির্বাচনের পর তারা পরাজয় স্বীকার করেনি। ২০০১-এর নির্বাচনের পরও তারা পরাজয় গ্রহণ করতে পারেনি। তারা সত্যিই মনে করে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও কারচুপির মাধ্যমে ২০০১-এ বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসেছে। সুতরাং জোট সরকার একটি অবৈধ সরকার। এ অবৈধ সরকার যেহেতু দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে সেহেতু এ সরকার পতনের সকল পন্থাই বৈধ ও নৈতিক। এই সেদিনও শেখ হাসিনা বলেছেন, একাত্তরের চেয়ে খারাপ অবস্থা এখন দেশে চলছে। এসব আওয়ামী নেতাদের রেটরিক (Rhetoric) বা বাগাড়ম্বর নয়, তারা সত্যিই বিশ্বাস করেন, দেশবাসী এখন চরম দুরবস্থায় আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের এই ধারণা ভুল। মিডল ক্লাস বা মধ্যবিত্ত সমাজ যদিও জোট সরকারের কাজে পূর্ণভাবে খুশি নয় তবুও তাদের অধিকাংশ এখনো বিএনপি-জামায়াত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয়নি। জোট সরকারের মুখর সমালোচনা এই মধ্যবিত্ত সমাজ করলেও আওয়ামী লীগের প্রতি তারা ঝুকে পড়েনি। রাজনীতিতে প্রভাব সৃষ্টিকারী মধ্যবিত্ত সমাজের এই মনোভাব আওয়ামী লীগ বুঝতে পারেনি বলেই ৩০ এপৃলের ডেডলাইন দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, ১৯৯৬-এর মে-জুনের মতো মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ আওয়ামী লীগের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। কিন্তু তা হয়নি। মাত্র আড়াই বছর পরেই মধ্যবিত্ত সমাজ তথা সারা দেশবাসী আরেকটি নির্বাচনের দিকে যেতে চায়নি।

দুই. একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন হলেই যে আওয়ামী লীগ তার ফলাফল মেনে নেবে সেই ভরসা মানুষ পায়নি। যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবারও বিএনপি-জামায়াত জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অথবা ১৫১টি আসনে বিজয়ী হয় তাহলে আওয়ামী লীগ কি সেই ফলাফল মেনে নেবে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। তাহলে কি মধ্যবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে আবার আড়াই বছর পরে আরেকটি মধ্যবর্তী নির্বাচন তারা চাইবে? এভাবেই কি আওয়ামী চাপে বাংলাদেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সিরিয়াল চলতে থাকবে? মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর পায়নি।

তিন. দেশের কিছু মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে। মফস্বলে আওয়ামী কর্মীরা সম্ভাব্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের বদলে বাস্তব পৌরসভা নির্বাচনে মনোযোগী হয়।

চার. সেনাবাহিনীতে ২০ মে ১৯৯৬-এর মতো কোনো ক্যু বা অস্থিরতা সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

পাচ. আমলাতন্ত্রে, বিশেষত সচিবালয়ে ১৯৯৬-এর মতো কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়নি। সেক্রেটারিয়েটে বিভিন্ন উস্কানিমূলক লিফলেট বিলি হয়। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। জনতার মঞ্চ গঠনে কেউ উৎসাহী হয়নি।

ছয়. আওয়ামী লীগের প্রতি প্রশিকা নেতার প্রকাশ্য সমর্থন দানকে অন্যান্য এনজিওরা মেনে নিতে পারেনি। ফলে প্রস্তাবিত গণঅভ্যুত্থানে প্রশিকা বাদে অন্য কোনো এনজিও এসে দাড়ায়নি।

সাত. অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে এরশাদের জাতীয় পার্টি গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে দাড়ায়নি। গণফোরাম কিছুটা অস্পষ্ট ভূমিকা নেয় এবং গণফোরাম নেতা ড. কামাল চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যান। কাদের সিদ্দিকী গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে যাননি।

আট. বিদেশি রাষ্ট্রদূতরাও, বিশেষত হ্যারি টমাস দেশে সাংবিধানিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনমত সংগঠন আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

নয়. কাকতালীয়ভাবে এবং সৌভাগ্যক্রমে ২ এপৃল রাতেই চট্টগ্রামে অস্ত্রের একটি বিরাট চোরাচালান ধরা পড়ে। মানুষ আশ্বস্ত হয় যে, সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর ও কার্যকর। মানুষ ধরে নেয় যে, এপৃলে আওয়ামী লীগ সৃষ্ট কোনো বিশৃঙ্খলা এই সরকার বরদাশত করবে না এবং সেটাকে সবলভাবে দমন করা হবে।

দশ. এই সময়ে জোট সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৯৯৬-এর মতো কোনো প্রশাসনিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয়া হবে না। ওই সময়ে বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন যেসব চরম ভুল করেছিলেন তার কোনো রিপিট শো করবেন না বর্তমান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঠিক *অপারেশন ক্লিন হার্ট*-এর মতোই *অপারেশন ক্লিন এপৃলের* পূর্ণ দায়িত্ব দেন তরুণ প্রতিমন্ত্রী বাবরের ওপর।

এগারো. প্রতিমন্ত্রী বাবর যে সাফল্য অর্জন করেছেন সেটি বোধহয় তার নিজের আশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুরুষ পুলিশ এবং নারী পুলিশ সাহস, ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে এপৃলে আওয়ামী লীগের প্রতিটি চাল, হরতাল, ঘেরাও এবং বিক্ষোভ মোকাবেলা করেছে। কিন্তু একটি লাশও তারা পড়তে দেয়নি। লাশলোলুপ শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা চরমভাবে হতাশ হয়েছেন। তারা কোনো ফটো অপরচুনিটির সুযোগ পাননি। কোনো লাশের পরিবারের পাশে ক্যামেরা বাহিনী নিয়ে গিয়ে ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপাতে পারেননি। সরকার পতনের ঘোষিত আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর এতো বড় সাফল্য এই প্রথম।

বারো, পহেলা বৈশাখ ১৪ এপৃলের কোনো জনসমাবেশে কোনো সহিংসতা ঘটতে দেয়নি পুলিশ।

তেরো. যে তিনটি সন্ত্রাসী দল রাজধানীতে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে অস্থিতিশীলতা আনতে পারতো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের শনাক্ত করে। এই তিনটি সন্ত্রাসী দল হলো কালা জাহাঙ্গীর গ্রুপ, সুব্রত বাইন গ্রুপ ও পিচ্চি হেলাল গ্রুপ। বিভিন্ন পন্থায় পুলিশ এদের নিষ্ক্রিয় করে রাখে এপৃল মাসে।

চোদ্দ. ১৯৯৬-এ প্রশিকা ঢাকায় মানিক মিয়া এভিউনিতে গণজমায়েত করতে সফল হলেও ২০০৪-এ হয়নি। কারণ ইতিমধ্যেই প্রশিকার নেতৃত্ব তাদের নৈতিক অবস্থানে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মফস্বল থেকে প্রশিকা কর্মীরা যাতে রাজধানীতে না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

পনেরো. ইনডিয়া নিজেদের সাধারণ নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও ইনডিয়াতে সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এপৃলের আওয়ামী কর্মসূচিতে ইনডিয়ানরা জড়িয়ে পড়তে চায়নি।

ষোল. আমেরিকাও জড়িয়ে পড়তে চায়নি। কারণ ইরাক অভিজ্ঞতা। এপৃলেই ইরাকে শুরু হয় প্রচণ্ড আমেরিকান বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ। এই শিক্ষার পরে, আরো একটি দেশে যেমন বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের নামে কোনো বিশেষ দলের পক্ষে আমেরিকা অবস্থান নিতে চায়নি - শেখ হাসিনা মুচলেকা দিয়ে থাকলেও! যদি তিনি দিয়ে থাকেন!

মোটামুটি এসবই ছিল আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত গণঅভ্যুত্থান ফেল করার কারণ। মইন বললো।

এতে কি আওয়ামী লীগের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল না? মিলা বললো।

হ্যা। খুব ক্ষতি হলো। ১৯৭৫-এ শেখ মুজিব বাকশাল পাথরের নেকলেস পরিয়ে দিয়েছিলেন তারই দল আওয়ামী লীগের গলায়। ঠিক তেমনি তারই কন্যা এবং জলিল ২০০৪-এ পরিয়ে দিলেন আরেকটি ভারী পাথরের নেকলেস, ৩০ এপৃল জোট সরকার পতনের ডেডলাইন ঘোষণার নেকলেস। ১৯৭৫-এর ভারমুক্ত হতে আওয়ামী লীগের সময় লেগেছিল ২১ বছর। এবার ২০০৪-এর ভারমুক্ত হতে কতোদিন সময় লাগবে তা আমি জানি না। আমি শুধু জানি, আবদুল জলিল ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন আগামী এক বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ কোনো আন্দোলনে যাবে না। আওয়ামী লীগ তার ক্রেডিবিলিটি বা বিশ্বাসযোগ্যতা চরমভাবে হারিয়েছে ৩০ এপৃল ডেডলাইন ঘোষণার ফিয়াসকোতে। এটাই আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। মইন বললো।

এই ক্ষতির দায় কে নেবে? এই দায় নিয়ে শেখ হাসিনা অথবা আবদুল জলিল কি পদত্যাগ করবেন? মিলা প্রশ্ন করলো।
৩০ এপৃলের প্রেস কনফারেন্সে এদের দুজনারই পদত্যাগপত্র অফার করা উচিত ছিল। বিদেশে এই অবস্থায় পড়লে যে কোনো নেতা-নেত্রীই তাই করতেন। কিন্তু এটা বাংলাদেশ। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর, এমনকি বিকল্প রাজনীতির নেতৃত্বও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সুতরাং কনভোকেশনের নামে আমেরিকায় শেখ হাসিনা সটকে পড়লেও এবং চিকিৎসার জন্য আবদুল জলিল কলকাতামুখী হলেও তাদের দলীয় অবস্থান একই থাকবে। আওয়ামী লীগের উপরের সারির বহু নেতাই থাকবেন সমালোচনামুখর কিন্তু পরিবর্তনে নীরব এবং বহু কর্মীই থাকবেন হতাশ কিন্তু পরিবর্তনে অনাগ্রহী। তবে আওয়ামী লীগের একটি পরিবর্তন যদি স্থায়ী হয় সেটি দল ও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এই প্রথম আওয়ামী লীগ লাশের বদলে তাশ দিয়ে আন্দোলনে বিজয়ী হওয়ার কথা বলেছে। লাশ নয়, তাশই যদি তাদের আন্দোলনের ৫২টি অস্ত্র হয় তাহলে সেটা দেশবাসীর জন্য স্বস্তিদায়ক হবে। মইন বললো।
আর এই ৩০ এপৃল ফ্লপ গণঅভ্যুত্থানে বিএনপির কি লাভ হলো? মিলা জানতে চাইলো।
আপাতদৃষ্টিতে বিএনপির লাভ হয়েছে এমনটা মনে হতে পারে। অন্তত এক বছর বিএনপি শান্তিতে দেশ চালানোর সুযোগ পাবে যদি জলিল তার কথা রাখেন। এই সময়ের মধ্যে যদি বিএনপি-জামায়াত জোট সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে তাহলে তাদের লাভ নিশ্চয়ই হবে। বিএনপির আরেকটি লাভ হয়েছে ৩০ এপৃলকে কেন্দ্র করে তাদের দলে নতুন কর্মচাঞ্চল্য এসেছে। মন্ত্রিসভায় তাদের কাজের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে। আশা করা যায়, অচিরেই মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন ঘটবে। তবে বিএনপির বড় ক্ষতিও হয়েছে ৩০ এপৃল ঘোষণার জন্য। মইন বললো।
কেন?
কারণ আওয়ামী লীগের শোচনীয় ব্যর্থতার পরে বিএনপি মন্ত্রী, নেতা-কর্মীরা এখন দাম্ভিক ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারেন। তারা এরোগ্যান্ট হতে পারেন। ফলে বিএনপি স্বৈরশাসনের দিকে দ্রুত ঝুকে পড়তে পারে। বিএনপির সেন্ট্রাল কমান্ড ভেঙে পড়তে পারে যার একটি অগ্রিম সংকেত এপৃলেই দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত এবং তার সচিবালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও ঢাকার কয়েকটি এলাকায় প্রধানমন্ত্রী ও তার পুত্রের স্তুতিমূলক একাধিক তোরণ বানানো হয়েছে। মানুষের মনে পড়েছে, অক্টোবর ২০০১-এ নির্বাচিত হওয়ার পর পরই খালেদা জিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় তোরণ কালচারের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। বিএনপি কর্মীদের যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় এবং মন্ত্রীরা যদি অহংকারী হয়ে ওঠেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জনগণ পথে নিশ্চয়ই নামবে। তবে আওয়ামী লীগের জন্য নয়, বিএনপিকে সরিয়ে তৃতীয় শক্তির আশায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ আওয়ামী লীগ দুর্বল হয়ে পড়ার কুফল হতে পারে সেটাই। মইন বললো।
আর বাংলাদেশের মানুষের কি লাভ-ক্ষতি হলো এই ৩০ এপৃল ডেডলাইন ঘোষণার নাটকে? মিলা জিজ্ঞাসা করলো।
লাভ তো কিছুই দেখছি না। আওয়ামী লীগের অবিমৃষ্যকারিতায় প্রায় দেড় মাস সারা দেশের মানুষ অনিশ্চয়তায় থাকলো। রাজনৈতিক দলের ওপর তারা আস্থা ও বিশ্বাস হারালো। সরকার ও বিরোধী দলের দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ গণগ্রেফতারের শিকার হলো। সরকার অবশ্য বলেছে, তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে। বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও ৩০ এপৃলে প্রেস কনফারেন্সে গণগ্রেফতার বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাকে মনে রাখতে হবে, এ গণগ্রেফতার যারা হন তাদের অনেকেই হয়তো ছিলেন বিএনপি সমর্থক। এরা কি পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে ভোট দেবেন? আবদুল মান্নান ভূঁইয়াও হয়তো বলবেন, নির্বাচিত সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত গণঅভ্যুত্থানের একমাত্র বিকল্প ছিল গণগ্রেফতার। গণঅভ্যুত্থান বন্ধ করার জন্য জাতিকে একটা মূল্য দিতে হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে গণগ্রেফতারে আটক প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। এই সংখ্যার সঠিক হিসাব দেয়া উচিত হবে এবং সম্ভব হলে কিছু ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিতে হবে। জোট সরকার যদি মিনিমাম এটুকু না করে তাহলে তারা স্বৈরাচারী রূপেই প্রতিভাত হবে।

গণগ্রেফতারের জন্য আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত গণঅভ্যুত্থানই দায়ী। শুধু এটা বলে জোট সরকার পার পাবে না। জেলখানা-হাজতের কষ্ট মানুষ ভুলবে না। মইন বললো।
তাহলে ৩০ এপৃল ডেডলাইন ছিল দেশের মানুষের প্রতি একটা নির্মম রসিকতা। মিলা আস্তে আস্তে বললো।
হ্যা। তুমি ঠিকই বলছো। আজ আরেকটি গল্প তোমাকে বলবো।

ছেলেটির বয়স ছিল দশ।
কৃকেট খেলতে গিয়ে হঠাৎ বল তার চোখে লাগে।
সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়।
এভাবেই তার দিন কাটতে থাকে।
একদিন তার মা তার ছেলেকে আশার বাণী শোনালেন।
শহরের সেরা আই সার্জন তোমার চোখে অপারেশন করবে। তুমি ভালো হয়ে যাবে। মা বললেন।
নির্ধারিত দিনে অপারেশন হলো।
সাত দিন পরে ছেলেটির চোখের ব্যান্ডেজ মা খুলতে লাগলেন।
মা, আমি কি আবার গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-পাখি সবই দেখতে পারবো? ছেলেটি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো।
হ্যা। তুমি সবই দেখতে পারবে। মা ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে বললেন।
মা, আমি কি আমার স্কুলের বন্ধু-বান্ধব, ভাইবোন, সবাইকে আবার দেখতে পারবো?
হ্যা। সবাইকে দেখতে পারবে। মা ব্যান্ডেজ খুলে চললেন।
মা। আমি কি আব্বুকে, তোমাকে, আবার দেখতে পারবো? ছেলেটি আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না।
হ্যা, হ্যা, পারবে। ব্যান্ডেজের শেষ অংশটুকু খুলে মা বললেন।
ব্যান্ডেজমুক্ত ছেলেটি আস্তে আস্তে চোখ খুললো।
তারপর সে দুই হাতে চোখ কচলালো।
তারপর সে আর্তনাদ করে উঠলো।
মা,মা, আমি যে কিছুই দেখছি না।
এপৃল ফুল! মা বললেন।
এটা একটা সিক (Sick) জোক। শেখ হাসিনা ও আবদুল জলিল ঠিক এ রকম নির্মম রসিকতাই করেছেন দেশবাসীর সঙ্গে। মইন বললো।
শুনেছি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ইন দিস কান্ট্রি, আমি এই দেশে রাজনীতি করা কঠিন করে দেবো। এখন ২০০৪-এ হাসিনা-জলিল ডুয়ো (Duo) হ্যাভ মেড পলিটিক্স এ কনস্পিরেসি, পলিটিশিয়ান এ ফ্রড এবং প্রেস স্টেটমেন্ট এ সিক জোক ইন দিস কান্ট্রি। এই দেশে হাসিনা-জলিল জুটি রাজনীতিকে পরিণত করেছেন একটি ষড়যন্ত্রে, রাজনীতিককে পরিণত করেছেন ভুয়া ব্যক্তিতে এবং সাংবাদিকদের কাছে দেয়া বিবৃতিকে পরিণত করেছেন নির্মম রসিকতায়। রাজনীতিকে এরা কঠিনতর করে দিলেন এবং এটাই হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। মিলা ফোন রেখে দিল।

১ মে ২০০৪